শ্রীমৎ বালকব্রহ্মচারীর দর্শনসার

শ্রী মহেন্দ্রনাথ সরকার

শ্রীমৎ
বালকব্রহ্মচারীর
দর্শনসার

শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার,
এম্‌-এ, পি-এইচ্‌-ডি

[সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ, ১৩৬০ সন

প্রকাশক—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, এম্-এ, বি-এল্
৩৯/২ সি, মনোহরপুকুর রোড্,
কলিকাতা-২৯
বাঁধাই—
মোহন বাইণ্ডিং ব্যুরো
১১০, বৈঠকখানা রোড্, কলিকাতা
মুদ্রাকর—
শ্রীবিহারীলাল দত্ত
নিউ ভিক্টোরিয়া আর্ট প্রেস
৮৪-এ, বৈঠকখানা রোড্, কলিকাতা

মূল্য—এক টাকা মাত্র

প্রকাশকের নিবেদন

পরমশ্রদ্ধেয় বালকব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত আমি অল্প দিন পরিচিত। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার সরলতা, জ্ঞানের গভীরতা ও অকৃত্রিম স্নেহে আমি বশীভূত হইয়াছি। তাঁহার সঙ্গলাভ আমার পক্ষে এক আশ্চর্য্য যোগাযোগ। এক শ্রদ্ধেয় সাধক ও বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার মাতুল বিষ্ণুদাস ঠাকুর মহাশয়কে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার (বিষ্ণুদাস) বংশের ত্রয়োদশ পুরুষে আবার এই ভাবেই ভাগিনেয় রূপেই তাঁহার আবির্ভাব হইবে। সম্প্রতি তিনি শুনিয়াছেন যে শ্রীশ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এ বংশের ত্রয়োদশ উত্তরপুরুষে সেই ভাবেই আসিয়াছেন এবং নানারকম অলৌকিক ঘটনাদ্বারা তিনি নিজকে প্রকাশ করিয়াছেন। আমার বন্ধুটি আমাকে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে বলেন। ইহার ২।৩ দিন পরেই আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাঃ মহেন্দ্র নাথ সরকারের সঙ্গে দেখা করিতে যাই। তিনি তখন একখানা গ্রন্থপাঠ করিতেছিলেন, সেই গ্রন্থ তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল, তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। গ্রন্থকারের নাম জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন এক মহাপুরুষের বাণী তাঁহার ভক্তরা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছে এবং তাঁহার নিকট সেই মহাপুরুষ সম্বন্ধে যাহা

শুনিলাম তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহল হইল। কথাপ্রসঙ্গে ডাঃ সরকার বলিলেন তিনি সেইদিনই বৈকালে সপরিবারে ঐ মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। আমি তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে চাহিলে তিনি সানন্দে সম্মতি দিলেন। সেই মহাপুরুষের নিকট উপস্থিত হইবার পর তাঁহার (ঐ মহাপুরুষের) মাতুল ভ্রাতা শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-চরিতের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া শুনাইতেছিলেন, তাহাতেও ঐ একই উক্তির পুনরুল্লেখ দেখিলাম—এই অপূর্ব্ব যোগাযোগে আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। আমি যাহাকে অনুসন্ধান করিতেছিলাম—দৈবচক্রে আমি অজ্ঞাতে তাঁহার নিকটেই উপস্থিত হইয়াছি। নিজ সৌভাগ্যকে আমি ধন্যবাদ দিলাম। সেই দিনই সেই বহু প্রশংসিত মহাপুরুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁহাকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার জ্ঞানের পরিধি ও তত্ত্বের অভিনবত্বে আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

আমি দার্শনিক নই, দর্শনশাস্ত্রের কিছু বুঝি না। প্রকাশকের নিকট কেহ প্রকাশিত বিষয়েয় জ্ঞান আশা করে না, লেখকের বা বক্তার পরিচয়মাত্র আশা করে। নিবেদন ইতি—

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

ভূমিকা

এই পুস্তকে শ্রীশ্রীবালকব্রহ্মচারীর উপদেশপূর্ণ কথাগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে, তাঁর কথাগুলো প্রায়ই দার্শনিক। তাঁর কাছ থেকে বাজে কথা কোনদিন শুনিনি। তাঁর কথা শুনে যা বুঝেছি তা-ই লিপিবদ্ধ করেছি। বালকব্রহ্মচারিজীর ভেতরে একটা দার্শনিক প্রতিভা আছে এবং তাঁর দার্শনিক মত তাঁর নিজের। তিনি স্বাধীনভাবে সেটা বলেন, দার্শনিক মতবাদে পরস্পরের আকর্ষণও আছে। উপনিষদের যুগ হতে এ পর্য্যন্ত অনেক দর্শনশাস্ত্রের প্রকাশ হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে একটি মতই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দার্শনিক জগতে এ দেশে শঙ্কর-মতের খুব প্রতিষ্ঠা—জীবব্রহ্মের অভেদত্বই একটা বিশিষ্ট মতবাদ। মানুষ মানুষের ভেতরে অনেক কিছু পায়, দর্শন উৎপত্তি হয়েছে মানুষ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ নিয়ে, এমন কি বৌদ্ধ-দর্শনের উৎপত্তিও ঐখান হতে। শঙ্কর বৌদ্ধবাদ খণ্ডন করেছেন, কিন্তু তাঁকে 'প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ' বলা হয়; তার অর্থ এই যে, শঙ্করের লেখার ভেতর দিয়ে বৌদ্ধবাদের কথাগুলো প্রকাশিত হয়েছে। বৌদ্ধবাদ দার্শনিকবাদের মধ্যে বড় বাদ, কেননা ঋষিবাক্য বা শাস্ত্রকে প্রমাণ না মেনে তাঁরা তত্ত্ব সম্বন্ধে কথা বলেছেন—এখানেই তাঁদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য (originilality); এই জন্যই বৌদ্ধবাদের অদ্যাপি এত জোর। বালকব্রহ্মচারিজী মতবাদের সহিত বৌদ্ধমতবাদের সহিত অনেক সামঞ্জস্য আছে,

থাকলেও বালকব্রহ্মচারিজীর নিজের স্বাতন্ত্র্য আছে। বৌদ্ধবাদের শূন্য ভাষায় প্রকাশিত হয়; কিন্তু বালকব্রহ্মচারিজীর মত শূন্যই সব—সমস্ত বস্তুর অভাবই সে জানাচ্ছে, শূন্য নিরবচ্ছিন্ন, বেদান্তের ব্রহ্ম নিরবচ্ছিন্ন। গৌরপাদের সাথে বালকব্রহ্মচারিজীর অনেক মিল আছে। নিরবচ্ছিন্ন শূন্যতাই বালকব্রহ্মচারিজীর লক্ষ্য। বৈদান্তিকের মত বালকব্রহ্মচারিজীর নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণতাই লক্ষ্য। অতএব দাঁড়াচ্ছে এই যে, পরিদৃশ্যমান জগত বালকব্রহ্মচারিজীর মতে ব্যবহারনিষ্ঠ, এর কোন তত্ত্ব নেই, এই হ'ল মূল কথা—একথাটুকু ধ্যানগম্ভীরে গাম্ভীর্য্যের সহিত বুঝতে পারলেই বালকব্রহ্মচারিজীর পুস্তক বুঝতে পারবে। বালকব্রহ্মচারিজীর দার্শনিক প্রতিভা এত সুন্দর যে তিনি সত্যকে প্রকাশ করতে কিছুই ভয় পান না, ঠাকুর-দেবতা যে সংস্কার নিয়ে হিন্দুরা দাঁড়িয়ে আছে, তিনি এ সংস্কার থেকে মুক্ত, সংস্কার মুক্ত হলেই নির্ব্বাণের কাছাকাছি মানুষ হয়, সংস্কারমুক্ত পুরুষদের সংসারে ঘাতপ্রতিঘাত খেতে হয়; কারণ, সংসার তো সংস্কারই মাত্র। সংস্কার-বিচ্যুত ব্যক্তি সংসারের বিরুদ্ধে—এইজন্যই তাঁদের কথার খুব সংসারে আদর হয় না, এইজন্যই বালকব্রহ্মচারিজীর এই প্রচারের জন্য তাঁকে অনেক বিপদ ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হতে হয়েছে। তিনি সব সময় সংসারের কথা হজম করতে পারেন না—নামরূপেতেই সংসারের আকর্ষণ—তিনি নামরূপ মুক্ত।

শ্রী মহেন্দ্রনাথ সরকার

শ্রীমৎ বালকব্রহ্মচারীর দর্শনসার

এক

বালকব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কয়েকখানি উপদেশ-সংগ্রহ পুস্তিকাকারে উপহার-স্বরূপ পেয়েছি। বহু দিবস পূর্ব্বে একবার তাঁকে দেখেছিলেম এবং গতকল্যও একবার দেখেছি। তাঁর কথাবার্ত্তাও সব অনুভূতিসম্পন্ন, দৃক্‌দৃষ্টির পরিধিও বড়, এইজন্য তাঁর সাথে কথা বলে জ্ঞানী মাত্রই বড় তৃপ্ত হন। তিনি হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে শুধু শাস্ত্রের কথাই বলেন না, তাঁর একটা নিজস্ব স্বানুভব আছে, তাকে অবলম্বন ক'রে তিনি সব কথারই উত্তর দেন, ইংরেজী ভাষায় যাকে বলে 'Original Thinker'। যদিও বলবো তাঁর কথাবার্ত্তায় শাস্ত্র-বিরোধিতা নেই, কিন্তু শাস্ত্রের মর্য্যাদা তিনি ভাষায় রসে প্রচার করেছেন, এইভাবে তাঁকে সকলে পছন্দ করবে। তাঁর যে

কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ হয়েছে, সেগুলোতে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ তত্ত্ব আছে, দার্শনিকের ভাষা আছে, পদ্ধতি আছে, যদিও সে পদ্ধতিতে নব্য ন্যায়ের প্রয়োগ নেই। বালকব্রহ্মচারিজী আনুভবিক পুরুষ, তাঁর এমন একটি পর্দা উত্তোলিত হয়েছে যে তাঁকে আর কথায় কথায় বিশ্লেষণে নেমে তত্ত্ববিচার করতে হয় না, তাঁর অনুভূতিসম্পন্ন চোখে তত্ত্ব আপনিই স্ফুরিত হয়— এই তাঁর লেখার পরম আকর্ষণ, এদিক্ দিয়ে তাঁকে বৈজ্ঞানিক বলা যায়। তিনি কোন তত্ত্ববস্তুতে আবৃত ক'রে কিছু লেখেন না, অথচ তাঁর লেখা এত স্পষ্ট মনে হয় যেন তিনি চোখে দেখে লিখছেন, এরূপ লেখকও আজকাল বিরল। বালক-ব্রহ্মচারিজীর পুস্তকগুলো দেখলে মনে হয় কত গভীর সত্তা থেকে তিনি আলোচনা করেছেন। পূর্ব্বেই বলেছি চক্ষুর উপর সমস্ত তত্ত্ব উদ্ভাসিত হলে এটা হওয়া সম্ভব। ভারতবর্ষে যাঁরা বড় দার্শনিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছেন তাঁদের পথও ছিল এই। টিকাটিপ্পনী অনেক পরে হয়েছে। অনুভূতি-আলোকে বড় জ্ঞানী সবটাই দেখে নেন এবং তাঁরা যা বলেন তা নিয়ে কথাবার্ত্তার সৃষ্টি হয়, যেমন আচার্য্য শঙ্কর। আচার্য্য শঙ্করের কোন কোন কথা নিয়ে যেমন 'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র উপর টিপ্পনী হতে হতে এত বড় বেদান্ত দর্শনের সৃষ্টি হলো—এ আর কিছু নয়; জ্ঞানী সত্যকে একবারেই দেখে নেন, তারপর টিকাকাররা সেই মতগুলোকে লিপিবদ্ধ করেন—ভারতবর্ষের

এই ছিল ধারা। এক শঙ্করকে অবলম্বন ক'রে পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, বিবর্ণাচার্য্য অনেক বড় বড় পুস্তক লিখেছেন, যা সূত্রাকারে ছিল তাই বিরাটাকারে স্ফুরিত হচ্ছে। বালক-ব্রহ্মচারিজীর তত্ত্বসম্পর্কীয় মহাবাক্যগুলোর উপর এইরূপ ভাষ্য হবে ইহাই আমার ধারণা। শঙ্করের সামান্য মিথ্যা লক্ষণ একটি মিথ্যাত্ব-দর্শন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছে। মিথ্যা কি ভাবে মিথ্যা—এই হলো বেদান্তের সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন। জগৎ আছে কি নেই—আমরা যা দেখি সে কিরূপ জ্ঞান, এই জ্ঞানের মূলে কি আছে। শঙ্করের মিথ্যাতে দৃষ্টি এত বড় যে স্বানুভূতি ছাড়া এ কথা কেউ বলতে পারে না। প্রত্যক্ষে নেই, স্বপ্নে নেই, সুষুপ্তিতে নেই, একথা তিনি জোরপূর্ব্বক বলেছেন, এইজন্য বেদান্তের ন্যায় স্থিত-প্রজ্ঞের উক্তি কোথাও হয়নি। স্থিত-প্রজ্ঞা তখনই আসে যখন মিথ্যা বন্ধনগুলো খণ্ডিত হয়ে উজ্জ্বল আত্মালোকে উদ্ভাসিত হয়। বালকব্রহ্মচারিজীর লেখনীর ভেতরে ততটা এ ধারা আছে, তিনি যা দেখেছেন, তাই লিখেছেন, যা দেখেননি তার উপর কোন কথাই বলেননি। তিনি ক্যান্ট, হেগেলের ন্যায় পাশ্চাত্য দার্শনিকের মত কোন কথাই বলেননি, কারণ তিনি অনুভূতিসম্পন্ন ; তাই শুধু তর্ক-বিজ্ঞানের দ্বারা বিরোধীপক্ষগুলোকে সামঞ্জস্য করেননি।

দুই

আচার্য্য শঙ্কর মিথ্যাত্বের লক্ষণ বলেছেন, 'স্মৃতিরূপঃ পরত্রপূর্ব্বদৃষ্টাবভাষঃ'—যে জিনিষ দেখা হয়েছে তার স্মৃতি অন্যত্র প্রতিফলিত হয়ে নূতন জিনিষ সৃষ্টি করে, যেমন শুক্তিতে রজতভ্রম। আচার্য্য শঙ্করের মতে ভ্রমটার একটা উপাদান আছে এবং পূর্ব্ব সংস্কারের সহিত একটা সম্বন্ধ আছে। শঙ্কর দর্শনে বিশ্বটাই ভ্রম, অবিদ্যায়ই জগৎ স্থিত, অবিদ্যারই জগৎ সৃষ্ট। বালকব্রহ্মচারিজী কোন বস্তুর বস্তুত্ব স্বীকার করেন না, তাঁর মতে সবই ব্যবহারনিষ্ঠ শূন্য অভিহিতে অভিহিত। আচার্য্য শঙ্কর বলেন, 'আশ্রয়ত্ব বিষয়ত্ব ভাগিনি নির্ব্বিভাগ চিতিরিতিকেবলা'—একমাত্র চিৎই চৈতন্য আশ্রয়রূপে ও বিষয়রূপে আছেন। আশ্রয়রূপে তিনি যখন প্রকাশিত হন তখন তাকে বলা হয় ব্রহ্ম, আর বিষয়রূপে যখন প্রকাশিত হয় তখন তাকে বলা হয় সংসার। এই উপাদানে কোন পার্থক্য নেই যখন আশ্রয় ও বিষয়ের সহিত অভিন্ন জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তখন হয় মুক্তি। সাধারণ লোক জীবত্বভাব নিয়েই থাকে। বেদান্তে মায়াকে বলা হয়, 'জীবপদা ব্রহ্ম বিষয়া', যাতে মায়া আশ্রিত তিনি ব্রহ্ম, যাকে মায়া বিষয় করে তিনিও ব্রহ্ম। এইভাবে দেখলে মায়া ব্রহ্মে আর জীবে কোন ভেদ থাকে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভেদ আছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত 'তত্ত্বমসি' বাক্য উপলব্ধি

হয় না—বেদান্তের প্রতিষ্ঠা এখানে—জীব ও ব্রহ্মে অভেদত্ব বেদান্তের লক্ষ্য, এই অভেদত্ব প্রতিষ্ঠাই বেদান্ত দর্শনের কাজ। সাধক যতই বড় হবে ততই এই অভেদত্ব তার আপনিই অনুভূত হবে, তার জন্য কোন প্রমাণ প্রয়োগ দরকার হয় না—সমস্ত হিন্দুর জ্ঞানের ভিত্তি এখানে, এমনি সাধনাতেও এই লক্ষ্য রয়েছে। বেদান্ত শুধু বিচারপ্রবণ দর্শন নয়—এর সাধনার ভিত্তি আছে এবং সেইজন্যই এটা এত বড়। সাধক মাত্রই ব্রহ্মানুভূতির দিকে অগ্রসর হলে তিনিই বুঝতে পারবেন এই বিশ্বটি তাঁকে অবলম্বন করে আছে। সমস্ত শারিরক ভাষ্যের মূল এখানে, এই স্থানে আরোহণ করলে জগতের মিথ্যাত্ব আপনিই প্রকাশ হতে থাকে। তর্ক যুক্তির দ্বারা তাঁকে জগৎ মিথ্যাত্ব বুঝতে হয় না—সাধকমাত্রই এরূপ বলে থাকেন এবং অনুভব করেন। আজকাল এই অনুভূতি সরে গিয়েছে বলে বেদান্তের আকর্ষণ নেই, নতুবা বেদান্ত পরম সাধনা দেয় এবং শ্রেষ্ঠ বাক্য বলে থাকে। মহাবাক্যগুলো ইহার ভিত্তি, 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'অয়ম আত্মা ব্রহ্ম', 'প্রজ্ঞান ব্রহ্ম'—এগুলোই মূল সূত্র, সমস্ত বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি এখানে। 'আমি ব্রহ্ম'—এই ভাবনায় অনন্ত শক্তির সহিত জ্ঞান প্রকাশিত হয়, উপনিষদগুলোর ভিত্তিও এখানে। বস্তুতঃ সমস্ত উপনিষদের বীজ ঐ এক প্রণবেতেই আছে। প্রণব চিন্তা করলে এবং তার শক্তি বিচ্ছুরিত হলে ব্রহ্মজ্ঞান

আপনিই এসে পড়ে—এর জন্য আর কিছু দরকার হয় না। স্বয়ং যম বলেছেন, 'এতদ্ আলম্বনং শ্রেষ্ঠং—এতদ্ আলম্বনং পরং—এতদ্ আলম্বনং জ্ঞাত্যা ব্রহ্মলোকে মহিয়তে।' উপনিষদ্ থেকে আরম্ভ করে এ পর্য্যন্ত তত্ত্বের সাধনা কেউ বাদ দেয়নি, তত্ত্বের অনুভবে ব্রহ্মের অনুভব হয়, এইজন্যই যম একথা বলেছেন। ইদানীং অনুভবের পথে না গিয়ে তর্কের ভেতর দিয়েই মীমাংসা হয়, সেইজন্যই বেদান্তের শক্তি বেশী প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না। তত্ত্বানুভবের পথে আছে এমন কৌশল যে স্তরে স্তরে অজ্ঞান ভেদ হয়ে পরম উজ্জ্বল তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। এইজন্যই উপনিষদের সাধনা হয়েছে তত্ত্বের সাধনা এবং তার আশ্রয় হয়েছে প্রণব। ঋষিদের সময় থেকে এই প্রণব উপাসনা স্থালিত হয়েছে, ছান্দোগ্য উপনিষদে এই উপাসনার কথা বলা হয়েছে এবং শেষে পরিপূর্ণ ব্রহ্মসত্ত্ব স্থিতি লাভ করবার কথা আছে। সমস্ত উপনিষদগুলো এইরূপে ব্রহ্ম উপাসনার উপর জোর দিয়েই একেই ব্রহ্মমার্গের গতি বলেছেন।

তিন

বেদান্তে একটা কথা আছে ব্রহ্ম গতি-অগতির অতীত, সমস্ত গতির আধার হয়েও তিনি স্থিতি স্বরূপ—এই স্থিতি তাঁর স্বরূপ, তাঁর স্বভাব, এইজন্য তিনি সমস্ত বিশ্বের ধারক। গতি অগতি সবই শক্তির ভেতর পড়ে। ব্রহ্ম কিন্তু সকল শক্তির অতীত, এইজন্য তাঁকে বলা হয় প্রজ্ঞা, যে প্রজ্ঞায় কোন শক্তির ক্রিয়া নেই। তিনি 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'—এই বেদান্তের শেষ কথা। পূর্ণ অনুভূতিতে এইটি অনুভূত হয়। তাঁর জ্ঞানের ভেতর কোন ক্রিয়া নেই, তিনি ক্রিয়াহীন, নির্ব্বাক্, নিষ্কম্প—উপনিষদে একথা পুনঃ পুনঃ উক্ত হয়েছে। মাণ্ডুক্য-শ্রুতিতে আছে জাগ্রত ভূমি, স্বপ্নভূমি, সুষুপ্তি ভূমি; কিন্তু ব্রহ্ম সকল ভূমির অতীত। তিনি 'নান্তপ্রজ্ঞং ন বহিপ্রজ্ঞং ন প্রপঞ্চ উপসম—শান্তং শিবং তুরিয়ং অদ্বৈতং', অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে কোন অবস্থা বিশেষ নেই, তিনি অন্তপ্রজ্ঞা নন, জাগরিত প্রজ্ঞা নন, সুষুপ্তি প্রজ্ঞা নন, তিনি প্রজ্ঞার স্বরূপ, যেখানে সব ক্রিয়া স্থির হয়ে যায় তাই ব্রহ্ম। তাঁকে বুঝবার একটিমাত্র উপায় আছে, তিনি জ্ঞানস্বরূপ—ক্রিয়াহীন হয়েও জ্ঞানের স্বরূপই তিনি—ইহাই বেদান্ত দর্শনের শেষ কথা। জ্ঞাতা জ্ঞেয় নেই, নাম-নামী নেই, তিনি স্তব্ধস্থিতধী—এই দৃষ্টিটাই উপনিষদের ভেতরে প্রচারিত হয়েছে; এই বাদের আর এক নাম

'অজাতবাদ', স্বয়ং গৌরপাদ এ বাদের স্রষ্টা। উপনিষদেও এই বাদের কথা আছে, বিশেষতঃ স্বপ্ন সুষুপ্তিও প্রজ্ঞার বিচার একে অবলম্বন ক'রে গৌরপাদের মাণ্ডুক্যকারিকার সৃষ্টি হয়েছে।

সত্যি বেদান্ত মতটি কয়েকটি অবস্থার জ্ঞানের উপর দাঁড়িয়ে আছে। জগতে ইন্দ্রিয়ের সহিত মন ক্রিয়াশীল, সুষুপ্তিতে মনের ক্রিয়া নেই, কিন্তু অবিদ্যার ক্রিয়া আছে। 'আমি কিছু জানি না'—এইটি সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির কথা, সেখানে বিষয় নেই, কিন্তু বিষয়ের অভাব আছে। এই বিষয় অভাবের থেকেই সব সৃষ্টি হয়। এইভাবে গৌরপাদকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলে অভিহিত করা হয়, তুরিয় ব্রহ্ম অনুভবের পূর্ব্বে সব বিশ্ব লীন হয়, একে বেদান্তের ভাষায় বলা হয় উপশম, বিশ্ব উপশম হয় জ্ঞানের লক্ষ্য, প্রপঞ্চ জ্ঞান থাকে না, শুধু মাত্র আত্মাই থাকে। প্রপঞ্চ বিচ্ছিন্ন হলেই আত্মজ্ঞান এসে পড়ে, কারণ আত্মা কখনও উপাধি নয়—আত্মা উপাধিহীন সত্তা, নিরাবরণ স্বরূপ জ্ঞান। এখানেও জ্ঞানের কোন ক্রিয়া নেই, বিষয় বিষয়ী বোধ নেই; বিষয় বিষয়ী বোধ নিয়ে সংসার, আত্মাতে সংসার বিগলিত—বেদান্তের মূল কথাই এই। অবশ্য 'তত্ত্বমসি' বাক্য নিয়ে ভাগ ত্যাগ লক্ষণার দ্বারা অনেক বিচার হয়েছে, কিন্তু সত্যিকারের আত্মাতে কোন লক্ষণই যায় না—'আত্মা শান্ত স্থিতধী'—সাধারণতঃ এই বলা হয়, কিন্তু এও আত্মায় পৌঁছে না; আত্মাকে কোন নির্দ্দেশবাচক বাক্যের দ্বারা বোঝান

সম্ভব নয়, এইজন্য শ্রুতিতে 'নেতি' কথা এসে পড়েছে। সত্যি যখন বেদান্তের জ্ঞান স্ফুরণ হয়, তখন জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্তির জন্য খুব ইচ্ছে থাকে না। এমন কি জ্ঞানী ব্যক্তি জানেনও না তিনি কি চান, অথচ তিনি নিত্য স্থিত শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত। অভাবের দিক্ দিয়ে প্রপঞ্চ উপশম কথাটা অতি সত্যি। প্রপঞ্চ গ্রহণ করে জ্ঞানের ক্রিয়া, কিন্তু পূর্ণ জ্ঞান যেখানে সেখানে ত্যাগ বা গ্রহণ কোনটাই নেই, এজন্য জ্ঞানীর লক্ষণ যে তিনি ত্যাগ ও গ্রহণের অতীত, তাঁর সন্ন্যাসও নেই। জ্ঞান হতে গেলেই বৃত্তিযুক্ত জ্ঞান হয়; আমরা যা দেখি যা শুনি তাতে কতকগুলো বৃত্তি আপনাআপনি আসে—প্রত্যক্ষস্থলে ফলব্যাপ্যত্ত হয়, আর ব্রহ্মজ্ঞান স্থলে বৃত্তিব্যাপ্যত্ত হয়, ফলব্যাপ্যত্ত স্থলে অন্তঃকরণে একটা concrete functioning হয়—যা দেখি তার অবিকল ছায়াটি ভেতরে আসে; বৃত্তিব্যাপ্যত্ত স্থলে তা হয় না, এজন্যই শাস্ত্রকারেরা বলে থাকেন যে মহাবাক্য স্থলে বৃত্তিব্যাপ্যত্ত হয়, ফলব্যাপ্যত্ত হয় না। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বাক্যের দ্বারা একটা বৃত্তির ধারা অন্তরে প্রবাহিত হয়। ঘট-প্রত্যক্ষ স্থলে কোন concrete বস্তু অন্তরে উদিত হয়, ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ স্থলে তা হয় না। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাকার বৃত্তি অন্তকরণে আরূঢ় হয়ে অজ্ঞান ধ্বংস ক'রে জ্ঞান আপনি প্রকাশিত হয়, তার প্রকাশের কোন কারণ থাকে না, এই হল বেদান্তের সিদ্ধান্ত। অবিদ্যা ধ্বংস মাত্রই ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ, আর কিছু

কারণ নেই; ক্রিয়াভূমিতে এটা সম্ভব—মাণ্ডুক্যকারিকায় একথাই বলেছেন। সত্যিকার লীলা বলে কোন জিনিষ বেদান্তে নেই যদিও স্বয়ং ব্যাসদেব লিখেছেন 'লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্'—এর শঙ্কর ভাষ্য করেছেন, কিন্তু বেদান্ত দৃষ্টিতে লীলা কথাটি টেকে না—অদ্বৈত যেখানে, সেখানে লীলা আবার কি? লীলা ভাবে আছে, কিন্তু তত্ত্বে নেই—অদ্বৈত তত্ত্বে অদ্বৈতই আছে, তাকে ভাষার দ্বারা বোঝান যায় না, এজন্য ভাষা ব্যবহার করতে গিয়ে নেতিমূলক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। সমস্ত ধর্ম্ম নিষেধবাচকমূলে ব্যবহৃত হয়েছে, একে উপনিষদ্ বলা হয়েছে, 'নেতিনেতি'। ব্রহ্মকে কেউ বোঝাতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম কখনও বিষয় হন না। ব্রহ্ম চিরকাল নির্ব্বিষয়, এজন্য তিনি বাক্য মন ও জ্ঞানের অতীত, এজন্য শাস্ত্রকারেরা তাকে বোঝবার জন্য বৃত্তি জ্ঞান কথাটা ব্যবহার করেছেন। ব্রহ্মকে অনুসন্ধান করলেই চিত্তের ভিতর একটা বৃত্তি বা wave উঠে—চিত্তটি transformed হয়ে যায়, প্রত্যেক বস্তুর সাক্ষাৎ করবার সময় একটি বৃত্তি হয়—যেমন পুষ্পের বৃত্তি, ফলের বৃত্তি, শব্দজনিত জ্ঞানে বৃত্তি হয়, কিন্তু এ প্রত্যক্ষ বৃত্তির একটা concreteness আছে; কিন্তু শব্দজনিত জ্ঞানে সেরকম concreteness নেই, এজন্য তত্ত্বমস্যাদি বাক্যে যার দ্বারা শেষকালে ব্রহ্মজ্ঞান দেওয়া হয়, তাতে শুধু থাকে একটি বৃত্তি, তাকে বলা যেতে পারে—'ব্রহ্মকারাকারিত বৃত্তি', কোন ব্যবহার পদার্থে বৃত্তি থাকে না,

শুধু ব্রহ্মকারা বৃত্তিই থাকে। এজন্য বলা হয় ব্রহ্মের বৃত্তিব্যপ্যত্ব আছে, কিন্তু ফলব্যপ্যত্ব নেই। এজন্য চিৎসুকাচার্য্য বলেছেন, শ্রবণ মাত্রই ব্রহ্মজ্ঞান হয়, যেহেতু আর কিছুতে অপেক্ষা করে না, এজন্য ব্রহ্মে বৃত্তিব্যপ্যত্ব থাকলে ফলব্যপ্যত্ব থাকে না, অন্তকরণ থাকে; কিন্তু তার tranformation হয় না। সাধারণভাবে আমরা যখন একটা ফুল দেখি, তখন আমাদের অন্তকরণের ভেতর দিয়ে চিত্তটি বহির্গত হয় এবং পুষ্পাকারে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু ব্রহ্মের বেলায় কোন বাইরের বিষয় থাকে না বলে চিত্তটিও বহির্গত হয় না, সে ভেতরে থেকেই এই ব্রহ্মকারেকারিত হয়। বৃত্তি অজ্ঞান ধ্বংস করেন, পদার্থটি আপনি প্রকাশ পায়, আত্মার ব্রহ্মকারাবৃত্তি স্থলেও তাই। শ্রবণমাত্রই ব্রহ্মকারা বৃত্তি হয় এবং সেটি অজ্ঞান ধ্বংস করে এবং সকল আশ্রয় যে আত্মা তিনি তখন প্রকাশ হন।

বেদান্তের সহিত সাধারণ উপাসনার ভেদ আছে, উপাসনা বলতেই আমরা ব্রহ্ম চিন্তা বুঝি এবং ধ্যেয় মাত্রই ব্রহ্মের রূপ বলেই মনে করি। বেদান্তের চতুর্থ পাদে এই কথাগুলো স্ফুট হয়েছে। বেদান্তের শেষ কথা হচ্ছে—'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাকার ধ্যানের জাগরণ। প্রণব উপাসনা প্রভৃতি উপাসনার কথাও আছে, কিন্তু তাতে এত জোর দেওয়া হয় না। উপাসনার দ্বারা কিছু লাভ হলেই তারা সন্তুষ্ট, কিন্তু বেদান্ত মতে উপাসনার শেষ স্তর হচ্ছে—অহং ব্রহ্মকারা এই বৃত্তির জাগরণ। চিত্তকে

ব্রহ্মের উপর আনয়ন করতে হলে ব্রহ্মের সহিত চিত্তের অভেদ ভাবনা বিশেষ দরকার, কিন্তু সতর্ক না থাকলে এটা অর্থাৎ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এটা সগুণ ব্রহ্মের উপর যেতে পারে, তাতে বহুবিধ শক্তি লাভ হয়, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান নাও হতে পারে, তাতে ব্রহ্মাকারাকারিত বৃত্তি নাও জাগতে পারে; কিন্তু বেদান্তের উপাসনার স্তরের শেষ স্তর হবে ব্রহ্মের সহিত নিজেকে অভিন্ন বোধ করা—বেদান্তের লক্ষ্যই এই। সাধারণ উপাসনায় এসব কিছু নেই। সাধারণতঃ উপাসনাকে বলা হয় প্রতীক উপাসনা। প্রতীক উপাসনায়, ব্রহ্মপ্রতীকের উপর ধ্যান থাকে এবং প্রতীকের যা অনুশ্রুত শক্তি সাধক সেইটি লাভ করে, সাধারণ উপাসনা ও বেদান্তের উপাসনার ভেতর তফাৎ এই—সাধারণ উপাসনায় রূপ রস শক্তি এইগুলো স্ফুরিত হয়; কিন্তু বেদান্তের উপাসনায় তা হয় না, কারণ উপাসক ও উপাস্যের অভিন্ন ভাবটিকে সময় সময় সামনে রাখে।

এইজন্য উপাসনার মন্ত্রই হচ্ছে বেদান্তে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। বেদান্তের উপাসনা সাধারণতঃ প্রণব উপাসনা। ইহাকে প্রতীক উপাসনা বলে। উপাসনা ক্ষেত্রে বেদান্তে উপাসক ব্রহ্মারূঢ় হতে পারে না—নানাবিধ বিভূতিতে এসে আচ্ছন্ন করে—জীবের জীবত্ব থেকে যায়, বিরাটের সংস্পর্শে আর বৃহৎ হয়ে উঠে—এটা বুঝেই বেদান্ত উপাসনার উপর জোর দেয় না, কারণ বেদান্ত চেয়েছে তত্ত্ব, শক্তি চায় না—তত্ত্বমসি বাক্যে বা

'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যে চিত্তটা উদার হয় এবং কোন বিষয়ে আকর্ষণ ক'রে কোন সিদ্ধি লাভের চেষ্টা থাকে না। এইজন্য 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্য আত্মার উপর গ্রহণ করা হয়েছে। আমি ব্রহ্ম, পাছে এই চিন্তাধারা বিভূতিমার্গে চলে যায়—এইজন্য সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে, এইজন্য বেদান্ত বলেছেন—অহং ব্রহ্মাস্মিতে ব্রহ্মাকারাকারিত বৃত্তি খুব বড়। অহং ব্রহ্মাস্মি বৃত্তি জাগ্রত হলে ভেতরে ক্ষুদ্রতা অপসারিত হয়—এমন কি ব্যাপকবোধও অপসারিত হয়। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে অন্তরের ভেতরে ব্রহ্ম দৃষ্টি স্ফুরিত হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারণা সব দূরীভূত হয় আর ভেতরে আত্মার অনুসন্ধান হয়। এমন কি উপাসনামার্গে আত্মার বিরাট বোধ তাও অপসারিত হয়—আত্মা 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্' এইভাবে স্ফুট হয়—এই শান্ত শিবস্বরূপ আত্মাই আমার স্বরূপ—এই ভাবটি জাগ্রত হলে আর কিছু অপেক্ষা থাকে না।

বালকব্রহ্মচারিজীর মতবাদে—অভিহিত শূন্যই হচ্ছে ব্যবহারনিষ্ঠ প্রধান তত্ত্ব, কোন বস্তুর বস্তুত্ব তিনি স্বীকার করেন না, ব্যবহারিক বিশ্ব নামাকরণ শূন্যে স্থিত—স্থিত, ধৃত এবং অতীত নামেই অভিহিত। অভিহিত শূন্যে অবস্থিত ব্যবহারিক বিশ্বে কোন রূপ নেই, কোন গুণ নেই, কোন ক্রিয়া নেই—অভিহিত শূন্য অভিহিতেই স্থিত। ব্যবহারিক প্রকাশক ও প্রকাশ্যের অভিহিত অতীতের অভিহিত অতীত। প্রকাশ,

প্রকাশক বাক্য, প্রয়োগ সব নামেই অভিহিত। খণ্ড, অখণ্ড খণ্ডকারতা যা কিছু সবই ব্যবহারিক কথিতে কথিত। বেদান্তের সাথে শূন্যবাদের অনেক তফাৎ আছে। বেদান্তে ব্রহ্ম কার্য্যতঃ শূন্যই হয়ে পড়ে, কিন্তু তার লক্ষণ আছে ; জগৎ যার থেকে রচিত এবং ধৃত, তিনি ব্রহ্ম—তার রূপ নেই, রস নেই, কিছুই নেই। বৌদ্ধরা তো বেদান্তকে শূন্যবাদই বলেন এবং এই বিষয়ে একে অবলম্বন ক'রে আচার্য্য শঙ্কর শূন্যবাদ খণ্ডন করেছেন, তাঁর দর্শনে বস্তুতঃ শূন্যবাদের থেকে ব্রহ্মবাদের কোন তফাৎ নেই। বৌদ্ধকে শূন্যবাদী বলা হয়—বৈদান্তিককে পূর্ণবাদী বলা হয়, কিন্তু বস্তুতঃ ভেদ কোথাও হয় না। শূন্য থেকে কি করে উৎপত্তি হয় এ নিয়ে অনেক কথার অবতারণা হয়েছে—পূর্ণের সদ্‌ভাবটা সর্ব্বদাই বিদ্যমান। এই তত্ত্বকে পূর্ণ বলে গ্রহণ করলে কথা বলবার সুবিধে হবে। শূন্য আর পূর্ণে ঝগড়া—কথারই ঝগড়া। তত্ত্ব-অনুভূতিতে পূর্ণই শূন্য হয়ে যায়, শূন্যই পূর্ণ হয়ে যায়। তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না, যারা তত্ত্ব বিশারদ, তারা এতে মগ্ন হয়ে থাকে এবং final গতি হয় নির্ব্বাকত্ব। বৌদ্ধদর্শন ও বেদান্তদর্শনের ভেতরেতে শূন্য ও পূর্ণ নিয়ে ঝগড়া, মতভেদ, গোলমাল সেটা সত্যিকারের দাঁড়ায় না, এইজন্য উপনিষদে বলা হয়েছে,,'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবা বশিষ্যতে'। তা হলে দেখা যাচ্ছে উপনিষদের মতও শূন্য কথাটি ব্যবহৃত হচ্ছে, শূন্য অর্থই হচ্ছে পূর্ণ, পূর্ণই হচ্ছে

শূন্য। বালকব্রহ্মচারিজী ঐ কথা বলে থাকেন, যদিও সাধারণতঃ তাঁকে শূন্যবাদী বলা হয়। তিনি পূর্ণ কথাটি খুব কমই ব্যবহার করেন, যদিও তাঁর ভাবনার ভেতরে পূর্ণত্ব পরিষ্কার রয়েছে—এই বিষয়ে তাঁর হিন্দুত্ব ঠিক আছে, তাঁর তত্ত্বব্যাখ্যা আমি শুনেছি—আমার কিন্তু মনে হয় না তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের শূন্যবাদী। বেদান্তের দিকেও পূর্ণকে যে ভাবে বলা হয়, তাতে শূন্যতাই এসে পড়ে—কিছু করে না, সৎ রূপের ব্রহ্মই থাকে, যে সত্যের কোন ধর্ম্ম নেই, বিষয় নেই, তার প্রকাশ নেই, সেই সৎ শূন্য হতে আলাদা কি হবে! এই শূন্যই নিত্য পদার্থ, বৈদান্তিকরা একেই ব্রহ্ম বলে থাকেন। পূর্ণ অদ্বৈতবাদের সহিত শূন্যবাদের কোন ভেদ নেই। অদ্বৈতবাদের শেষ কথাই হচ্ছে 'তত্ত্বমসি', এই বাক্যের দ্বারা অহং ব্রহ্মাস্মি ইত্যাকার বৃত্তির উদ্ভব হয়—এ বৃত্তিতে অনুভবে আসে যে ব্রহ্ম পদার্থে কিছুই নেই, তিনি স্বরূপেতেই আছেন, শ্রীমৎ বালকব্রহ্মচারিজীর কথায় এটিই প্রকাশ পেয়েছে। তিনিও শূন্যের সহিত আত্মার একত্ব করেছেন।